PG-BG-5

প্রশ্নঃ পরাণ মণ্ডলের মধ্য দিয়ে বঙ্গদেশের কৃষককুলের দুর্দশার স্বরূপ কীভাবে ব্যক্ত হয়েছে 'সাম্য' প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখুন।

Ans.: বঙ্কিমের স্বল্প সংখ্যক সামাজিক প্রবন্ধের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রচনা 'বঙ্গদেশের কৃষক'। অভিনিকো তথ্যানুসন্ধান, কৃষক প্রীতি এবং সমাজমনস্কতার দিক থেকে প্রবন্ধটি অতুলনীয়। নগরবাসী মধ্যবিত্ত চিন্তাবিদের পল্লিমুখিতারে উজ্জ্বল নিদর্শন এই প্রবন্ধ । জেগে ওটা উনিশ শতকের নগর সর্বস্ব চিন্তাধারা মাঝখানে পল্লির কৃষক বা রায়তদের সমস্যার দিকে ঐকান্তিক সযত্ন দৃষ্টি রাখার এক বিস্ময়কর ঐতিহ্য তৈরি করেছিলেন শতাব্দীর মনীষীরা। পরম্পরা থাকেলও এই দৃষ্টি ক্ষেপকে কেমন যেন বিচ্ছিন্ন বলেই মনে হয়। ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থার হালহকিকৎ নিয়ে এঁদের উৎকণ্ঠা ও কৌতূহল অবশ্যই বিস্ময়কর।

'সাম্য'প্রবন্ধে মোট ৫টি পরিচ্ছেদ এবং একটি উপসংহার অংশ রয়েছে । প্রথম পরিচ্ছেদে বৈষম্য এই প্রাকৃতিক নিয়মের নিরাকরণে কী ভূমিকা পালন করেছেন তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বৈষম্য এক প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাকৃতিক অনেক বৈষম্যের নিয়ম করে আমাদের এই সংসারে পাঠিয়েছেন। প্রকৃতি নির্দেশিত বৈষম্যের দুই ধরন প্রকৃতি বৈষম্য এবং অপ্রকৃত বৈষম্য। এই অনাকাঙ্খিত অপ্রকৃত বৈষম্যের নিরাকরণে বিশ্বের তিন মনীষী উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিপরীত দার্শনিক মতের এই তিনজন সম্প্রচারক হলেন বুদ্ধ, খ্রিষ্ট, ও রুশো। বর্ণগত বৈষম্য ভারতবর্ষের কাছে এক বিভীষিকা। ব্রাহ্মণ্যবাদের একচ্ছত্র আধিপত্যে বিপ্রেতর শূদ্ররা এক ব্যবস্থার জাঁতাকলে পড়ে মুক্তির রাস্তা পাচ্ছিল না কোনোক্রমেই। বুদ্ধদেব এসে শূদ্র সাধারণের ত্রাণের ব্যবস্থা করলেন।

প্রবন্ধের ৩য় পরিচ্ছদে দেশীয় কৃষি ব্যবস্থায় কৃষকের হয়েরানি নিপীড়নের একটা সাম্বৎসরিক ছবি আছে। কল্পিত ব্যক্তি পরাণ মণ্ডল বৎসরের বিভিন্ন মরশুমে কিভাবে জমিদারের নিত্যনতুন পার্বনি বা অর্থ আদায়ের জালে পড়ে সর্বস্বান্ত হয় তার সত্য বিবরণ এখানে দাখিল করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। জমিদারের নজরানার আবার কত মনোহারী নাম—আগমনী নজর সেলামি ইত্যাদি আর্থিক শোষণের তীব্রতা দেখিয়েও বঙ্কিমের মনে হয়েছে সব জমিদারই একভাবে অত্যাচারী নন। এঁদের মধ্যে অনেক ভালো জমিদারও আছেন। যাঁহারা জমিদার দিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাঁহাদের বিরোধী। গ্রামের বিদ্যালয় চিকিৎসালয়, অতিথিশালা ইত্যাদি নির্মাণ করে এঁরা সৎ কার্যানুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করে থাকেন। জমিদারের সমাজে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন ও প্রজাপীড়ন বা অন্যায় পরায়ণতা বিষয়ে সজাগ। বঙ্কিমের জমিদার সম্প্রদায়কে ও আত্মসংযম হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে সাম্যনীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ। বঙ্কিম দুটি বিষয়ের অন্তর্ভেদ করতে চেয়েছেন—১. ভারতবর্ষে সামাজিক বৈষম্যের হেতু কি? ভারতীয় প্রজারা চিরকাল উন্নতিহীন কেন? প্রথমে আবশ্যক সামাজিক ধনসঞ্চয়ন। শ্রমবিরত শ্রেণির জ্ঞানান্বেষণের জন্য উৎপাদনে শ্রমোপজীবীদের অধিক উৎপাদনে অভ্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। তা হলে জ্ঞানার্জনের পরে সভ্যতার উন্নতি হওয়া অসম্ভব। ভূমি উর্বর এবং উষ্ণ জলবায়ুর দেশে সামাজিক ধন সঞ্চয়নের সুযোগ অধিক। কারণ উর্বরা জমিতে অধিক শস্য উৎপন্ন হয় উষ্ণতাযুক্ত দেশের মানুষের খাদ্যের প্রাকৃতিক প্রয়োজন অল্প, ফলে উদ্বৃত্ত উৎপাদন সামাজিক ধনসঞ্চয়ের কারণ হয়ে উঠতে পারে। ভারতবর্ষে এই দুই কারণ বশেই প্রাচীনকাল ভাল সভ্যতার উন্নত হয়ে উঠেছে। ধনসঞ্চয়ের ফলে প্রাচীন কাল থেকেই সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে, এক ভাগ শ্রম করে, এক ভাগ শ্রম করে না। বুদ্ধিজীবীরা শ্রমজীবীর উৎপাদিত ধনের উপর নির্ভরশীল।

ঠিক এই নিয়মানুসারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলে কিন্তু এক বাড়তি অনিষ্টের সূচনা করে।

ধনবৃদ্ধি ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে সমতা বা ভারসাম্য না থাকলেই সমূহ বিপদ। বঙ্কিমচন্দ্র এই সমস্যা সঙ্কটের দুটি সহজ প্রতিবিধানের কথা তুলেছেন। ১. দেশীয় লোকদের কিয়দংশের দেশান্তরগমন এবং ২. বিবাহ প্রবৃত্তির দমন। য়ুরোপের জাতিসমূহ স্থানান্তর গমনে অনায়স পটুতা অর্জন করেছে। সুতরাং এই পরীক্ষিত পথে লোকসংখ্যার ভার কিছুটা কমানো যায়। কিন্তু কখনো ভারতবর্ষের মানুষ উষ্ণতা জনিত আলস্য ও নিরুৎসাহ ভাবের জন্য এই দুই পন্থা অবলম্বনই পিছিয়ে আছে। অভ্যাসগত আলস্য ও নিরুৎসাহ থেকে জন্মায় সন্তোষ। ভারতীয় দর্শনের ঐহিকতা বিরোধী সম্প্রচারের এটাই একটা হেতু। ঐত্যিহাসিতা সুখের চর্চায় নগ্ন য়ুরোপ সভ্যতা বৃদ্ধির নিত্য নতুন চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হতে পারল। আর ভারতবর্ষ একবার প্রাচীনকালে সভ্যতার উন্নত হওয়ার পর নিবৃত্তি মার্গের জ্ঞানের অধিগত হয়ে নিশ্চেষ্ট নিদ্রিত রয়ে গেল। ফলে তার বৈষম্য দূরীকরণের প্রকৃত কোনো সুরাহা হল না।

সাম্যতত্ত্ব মতেই নারীর শিক্ষার সর্বাগ্রে প্রয়োজন। নারীদের বিদ্যার্জনের জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা থাকাই বিধেয়। বিবাহ বিষয়েও নারী পুরুষের অধিকার সাম্য থাকা প্রয়োজন। এখানেই আমরা প্রথম একাধিক বিবাহ ও বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে বঙ্কিমের পরিষ্কার কিছু মতামতের সন্ধান পেয়েছি। সকল বিধবার বিবাহ হওত্তা কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভালো। স্নেহময়ী সাধ্বী বিধবাদের কথা স্বতন্ত্র কিন্তু পতির লোকান্তর গমনের পর কোনো বিধবা পুর্নর্বিবাহে ইচ্ছাবতী হলে তাকে সে বিষয়ে অধিকারিনী গণ্য করাই উচিত।

উপসংহার বঙ্কিম সমঝে দিয়েছেন যে যথেচ্ছা সাম্যনীতি প্রবর্তন তাঁর 'সাম্য' পুস্তিকা রচনার লক্ষ্য নয়। বুদ্ধি মানসিক শক্তি, বল ও শিক্ষানুসারে সাম্যতত্ত্বের তারতম্য ঘটা স্বাভাবিক ।

'কৌতুক হাস্য' ও 'কৌতুক হাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধদুটি অবলম্বনে 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিন।

১৮৯৭ খ্রিঃ বাংলা ১৩০৪ বঙ্গাব্দে 'পঞ্চভূত' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। 'কৌতুকহাস্য' ও 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' রচনা দুটি গ্রন্থটির অন্তর্গত। গ্রন্থের অন্যানো রচনা পরিচয়, 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ' , 'নরনারী' , 'পল্লিগ্রামে' 'মনুষ্য' 'মন' , 'অখণ্ডতা' , 'গদ্য ও পদ্য'— সাধনায় ১৩০০-১৩০১ এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালে কোন রচনার শিরোনাম ছিল 'পঞ্চভূতের ডায়ারি', রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তা পরিমার্জনা পরিবর্জনা সংযোজন এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। ১৩১৪ এর বৈশাখে প্রকাশিত 'বিচিত্র প্রবন্ধে'-র গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়েছিল রচনাগুলি। যদিও সাধারণ্যে পরিচিত থেকে গেল 'পঞ্চভূত' নামে।

গ্রন্থটির প্রথম প্রবন্ধ 'পরিচয়' ও ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। এই প্রবন্ধটিতে ডায়েরি সম্পর্কে কিছু অভিমত প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে। এর মধ্যে প্রবন্ধের 'আমি' অর্থাৎ ভূতনাথ বাবুর বক্তব্য অনুসারে করা যেতে পারে। ভূতনাথ বাবু বলেছেন– 'ডায়েরি একটি কৃত্রিম জীবন। কিন্তু যখই উহাকে রচিত করিয়া তোলা যায় তখনই আমাদের প্রকৃত জীবনের উপর কিয়ৎ পরিমাণে আধিপত্য না করিয়া ছাড়ে না । একটা মানুষের মধ্যেই সহস্রভাগ আছে, সবটাকে সামলাইয়া সংসার চালানো এক বিষম আপদ, আবার বাহিত হইতে স্বহস্তে তাহার একটি কৃত্রিম জুড়ি বানাইয়া দেওয়া আপদ বৃদ্ধি করা মাত্র। আমি নিজেকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে চাহি না। ভিতরে একটা লোক প্রতিদিন সংসারের উপর নানা চিন্তা নানা কাজ গাঁথিয়া গাঁথিয়া এক অনাবিস্কৃত নিয়মে একটি জীবন গড়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ডায়েরি লিখে গেলে তাকে ভেঙে আর একটি লোক গড়ে আর একটি দ্বিতীয় জীবন খাড়া করা হয়।

দুটি উদ্ধৃতিই ডায়েরি সংক্রান্ত, আর প্রতিটি প্রবন্ধই ডায়েরির অনুলিপি। শুধু তাই নয়, ডায়েরি সংক্রান্ত অভিমত যে প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে সেটিই 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধের প্রথম প্রবন্ধ। ফলে সব মিলিয়ে ডায়েরি সংক্রান্ত এই অভিমতগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। ডায়েরি লেখার কাজের মধ্যে আছে জোড় মেলানো। সেখানে সমস্ত বিরোধ, বৈপরীত্যের মীমাংসা প্রদানের প্রচেষ্টা থাকে। যুক্তি সঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর তাগিদ থাকে। ফলে ডায়েরিতে উঠে আসা বিচিত্র ভাবনা একটি নির্দিষ্ট অভিমুখে ধাবিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন 'পঞ্চভূত' এর একটি প্রবন্ধকে ভূতনাথবাবুর লিখিত ডায়েরি বলতে চান তখন একদিক দিয়ে তা প্রতিদিন সংসারের উপর নানা চিন্তা, নানা কাজ গেঁথে যেভাবে একটি জীবন গড়ে উঠেছে তার ওপর 'দ্বিতীয় জীবন' খাড়া করা। এর ফলে প্রবন্ধগুলি ভূতসভার সঠিক অর্থে ধারা বিবরণী থাকে না, হয়ে ওঠে ভূতনাথবাবুর ভূতসভা সম্পর্কিত অভিমতের অনুলিপি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য তা নয়। নয় বলেই ভূতনাথ জানান– "এমন সব কথা লিখিব যাহা আমাদের সকলের। এই আমরা যে সব কথা প্রতিদিন আলোচনা করি অবশ্য ভূতনাথ জানিয়ে দেন সে ডায়েরি সত্যের অনুরোধে লেখা হবে না, আমি তোমাদের মুখে কথা বানাইয়া দিব। মুখে কথা বানিয়ে দেবার অধিকার থাকাতে 5 ভূতনাথ বাবুর নিজস্ব অভিমত প্রকাশের সুযোগ বেশি পান সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানে মনে রাখতে হয় এখানে কল্পনা করা হয়েছে আরও পাঁচটি চরিত্র, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কথা জানিয়েছেন, ফলে তাঁদের মুখের কথাকে সেই চরিত্রের স্বভাব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হতে হয় ।

অর্থাৎ ডায়েরির মধ্যে যে ব্যক্তিগত স্বরের প্রাধান্য তাকে যেমন প্রয়োজনে ব্যবহার করছেন লেখক, আবর প্রয়োজনে তার সীমানাকে ভাঙছেনও। প্রতিটি প্রবন্ধই ভূতনাথবাবুর ডায়েরির অনুলিপি –এই ভাবনার মধ্যে আছে ব্যক্তিগত স্বরের প্রাধান্য। কিন্তু প্রতিটি প্রবন্ধই একটি নির্দিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক। বিষয় যেখানে নির্দিষ্ট হয়ে যায় সেখানে তা একান্ত ব্যক্তিগত থাকতে পারে না, বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার প্রবণতা এখানে জাগ্রত হয়। আবার সেই বিষয় সম্পর্কে কেবল ভূতনাথবাবুর অভিমত প্রকাশের সুযোগ নেই, আছে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের অভিমত প্রকাশের অবকাশ । ফলে প্রবন্ধের বিষয়বস্তুতে বিভিন্ন মাত্রা সংযুক্ত হয়, উঠে আসে বহু স্বর। আবার এই বহু স্বরকে যেভাবে ভূতনাথবাবু সজ্জিত করেন, যার ফলে একটি সিদ্ধান্তের অভিমুখে প্রবন্ধটি ধাবিত হয় বা পৌঁছায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভূতনাথবাবুর জবানীতেও তা শেষ হয়। তাতে ভাবনার বৈপরীত্য, অসামঞ্জস্য গুলি প্রবন্ধটির পর্বে পর্বে যেমন যায় তেমনি ঐক্যের তানটিও ধরে নিতে পারি। প্রবন্ধের চেনা-আদল এইভাবেই অতিক্রম করে যায় পঞ্চভূত?

অসঙ্গতি কমেডি ও ট্রাজেডি উভয়ই বিষয়। কমেডিতে আমোদ এবং কৌতুককে সমীর সুখ বলতে নারাজ বরং তাঁকে বলতে চান নিম্নমাত্রার দুঃখ। স্বল্প পরিমাণের দুঃখ ও পীড়ন আমাদের চেতনাতে যে আঘাত তৈরী করে তা একধরনের সুখের জন্ম দেয়। চড়ুইভাতিতে আমরা নিয়মভঙ্গ করে বহু কষ্ট সহ্য করে, অসময়ে অনেক অখাদ্য গ্রহণ করি কিন্তু তাই আমাদের কাছে আমোদ। আবার হুঁকা হাতে রাধিকার কুটিরে উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি আমাদের ধারণাক আঘাত করে। এই আঘাত ঈষৎ পীড়াজনক, কিন্তু যেটুকু পীড়া দেয় তা কৌতুক সৃষ্টি করতে পারে।

রূপকথা কি সত্যই অলীক ও অবাস্তব। পঠিত প্রবন্ধ অবলম্বনে যক্তিসহ আপনার অভিমত লিখুন।

রূপকথার রচয়িতার কোনো নামকরণ হয় নাই। সমস্ত অলৌকিক সাহিত্যের ন্যায় এখানেও লেখক একটি সমগ্র জাতির পশ্চাতে আত্মগোপন করে আছেন। এখানে ব্যক্তির বিশেষের কোনো কথা না, সমস্ত জাতিরই প্রাণের কথা, অন্তরতম আশা-আকাঙ্খা ইহাতে ধ্বনিত হয়ে উঠিতেছিল। পুরাতন সাহিত্যের ইহা একটি গুণ। মহাকাব্যের বিশাল দেহে অনেক নামহীন লেখক নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মিলিয়ে দিয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েছেন, যেমন 'জাতির আত্মা বৃত্তহীন পুষ্পসম' 'আপনাতে আপনি বিকশিত' হয়ে উঠিয়া স্বতন্ত্র ব্যক্তি বিশেষের অপেক্ষা রাখে নাই। লৌকিক গানে গাথায় ও সেইব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অভাব লক্ষিত হয় যেন জাতি তাদের রচয়িতাকে সম্পূর্ণরূপে অবসর দিয়ে

সেগুলিকে একেবারে খাস সম্পত্তি করে লয়েছেন। রূপকথার রাজ্যে ও সেই একই নিয়ম কোথাও লেখকের নিজের এতটুকু কোনো ছাপ নেই, সর্বত্র একটা উদার, বিশাল, অনাসক্ত ভাবের লীণ সুপরিস্ফুট। রাজা রাজভার কথা ইহার বিষয় বস্তু হইলেও সাধারণ লোকের যে ক্ষীণ সমায়িক সংকেত ইহাতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে বিদ্বেষ বা অবাস্তব লেশমাত্র চিহ্ন নাই। রাজপুত্র কখনও বিপদে পড়ে দরিদ্রের কুটীরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন ও তাদের দ্বারা পুত্রবৎ প্রতিপালিত হয়েছে। তার সৌভাগ্য সূর্য যখন উদিত হয়েছে তখন তার কিরণ হতে তার দরিদ্র উপকরণও বঞ্চিত হয় না। সর্বত্রই একটা সাম্য শক্তির ভাব। সমাজের সঙ্গে লেখক এমন সম্পূর্ণ অন্তরঙ্গভাবে জড়িত হয়ে গেছেন যে, তাঁর নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তাঁর ভাষা একেবারে মৌন হয়ে আছে ।

আমাদের বঙ্গদেশের সামাজিক ব্যবস্থা ও বিচারের কি এক সম্পূর্ণ ছবি এই রূপকথার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ইহার রচনার কাল সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ হইলেও ইহা নিঃসংশয়িতাভাবে বলা যায় যে, আমাদের বঙ্গদেশের পরিবার ও সমাজের একটি নিখুঁত ছবি এর মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের বহু বিবাহ, আমাদের গৃহের সপত্নী বিরোধ, সপত্নী পুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচার, রূপসী প্রণয়িনীর মোহ ও পরিশেষে সেই মোহভঙ্গ, আমাদের শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি কল্পনার উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হয়েছে আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়। রাজপুত্র শ্বেতবসন্তের কাহিনী যখন বক্তর করুনার্দ্র অশ্রুতরস করেঠ কথিত হয়, তখন শিশুর ত কথাই নাই, কোন বয়স্ক ব্যক্তিও বোধ হয় অশ্রু সংবরণ করতে পারে না। এই গল্পের উপর রামায়ণের ছায়াপাত হইলেও ইহার একটি নিজস্ব অনুপম মাধুর্য ও সৌন্দর্য আছে, হির অন্তনির্হিত গভীর করুণ রস সরল। শব্দাড়ম্বরহীন ও সাহিত্যকতা বর্জিত ভাষার সাহায্যে প্রবাহিত হয়ে আমাদের হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যন্ত দ্রবীভূত করে। এই রূপকথার মধ্যে আমাদের সমস্ত সামাজিক বৈষম্য ও পারিবারিক সমস্যা এমন একটা আদর্শ শান্তি ও কল্পিত সমাধানের মধ্যে পর্যবসিত হয় যা বাসস্তব জীবনে একান্ত দুর্লভ এবং যার অভাব আমাদের সমস্ত জীবন প্রবাহে একটা অব্যক্ত মধুর, অবিচ্ছিন্ন করুণ মর্মর জাগিয়ে তোলে। এইরূপ রূপকথা বাস্তবজীবনের সমস্ত অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করে তোলে। নিষ্করুণ দৈবের বিচার উল্টাইয়া দেয় এবং মানুষ নিজের ভাগ্যবিধাতা হলে কিরূপ পরিপূর্ণ সুখ ও শান্তির মধ্যে আপনার ত্রুটিবহুল ও ভ্রমসংকুল জীবন নাট্যের উপর শেষ যবনিকাপাত করত তার সুস্পষ্ট আভাস দেয়।

রূপকথার দিগন্ত বিস্তৃত তেপান্তরের মাঠ দিয়েই তাঁর প্রথম কল্পনার অশ্ব ছুটিয়ে দেন ও প্রাত্যহিক জীবনের সংকীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে অজ্ঞাতের রাজত্বে প্রথম পদক্ষেপ করতে শিখেন। সেখান কার মণি মাণিক্যের জড়াজড়ি তাঁহাদের সুপ্ত সৌন্দর্যবোধ ও কবিত্বশক্তিকে জাগিয়ে তোলে। যে দেশে জীবনে বৈচিত্র্য ও বর্ণসুষমার একান্ত অভাব, সেখানে শান্তনিষ্ট জীবনযাত্রার মধ্যে কোন প্রকার দুঃসাহসিকতা অবসর থাকে না সেখানে অনেকসময় এই রূপকথার খোলা জানলা দিয়েই আমরা বিচিত্র কল্পলোকের পরিচয় লাভ করি ও বিপুল সুদূরের ব্যাকুল বাঁশরী আমাদের কর্ণপথে ধ্বনিত হয়। অনেক ইংরেজ কবি রূপকথার প্রতি তাঁদের মনের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে গিয়েছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর আত্মজীবনী কাহিনীতে এই লৌকিক গল্প কিরূপে তাঁর কল্পনা শক্তিকে উন্মোষিত করেছিল কিরূপে এর সাহায্যে তিনি প্রাত্যহিক জীবনের তুলনা ও সংকীর্ণতা অতিক্রম করে এক বিশালতার রাজ্য স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের সুখ অনুভব করেছিলেন তার বিবরণ তুলনা ও সংকীর্ণতা অতিক্রম করে এক বিশালতর রাজ্যে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণে সুখ অনুভব করেছিলেন তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

রূপকথা রাজ্যের মেঘখণ্ড আমাদের শিশু অন্তরের গোপন স্তরে প্রথম সঞ্চারিত হয়। তখন পরবর্তী জীবনের রহস্যবোধকে তার সমস্ত আলো ছায়া ঘেরা বিচিত্রতাকে আমাদের অন্তরের অন্তপুরে বরণ করে আনে এবং সেই ১ সঞ্চিত মেঘ রাশির চতুর্দিকেই আমাদের কল্পনার বিদ্যুৎ বিলাস স্ফুরিত হয়। শৈশবের প্রতি নিগূঢ় আকর্ষণ মানব হৃদয়ের সনাতন প্রবৃত্তি এবং এই প্রবৃত্তির বশে যখন আমরা সুদূর শৈশবের প্রতি উৎসুক ব্যাকুল দৃষ্টিক্ষেপ করি তখন তাহার সমস্ত ক্রীড়া কৌতুক ও উচ্ছ্বাস চাপল্যের মধ্যে সেই বর্ষারাত্রের রূপকথার নিবিড় মোহময় স্মৃতি আমাদের অন্তরে শুকতারার ন্যায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে ও আমাদের বৈচিত্রহীন প্রৌঢ় জীবনের উপর তার মায়াময় ইন্দ্রজাল সংক্রামিত করে।

প্রশ্নঃ অবয়ববাদ সম্পর্কে প্রাগ্ গোষ্ঠীর মতামতগুলি উল্লেখ করে এর গ্রহণ যোগ্যতার কারণগুলি আলোচনা করুন।

Ans.: অবয়ববাদকে অনেকে একটা পদ্ধতি বলতে রাজী নন। তাঁদের কাছে এটি হল জগৎ ও জীবনকে দেখার একটি দৃষ্টিভঙ্গি। এই মত অনুসারে অবয়ববাদকে একটি রচনাকর্মের নির্বস্তুকে সম্পর্কগুলির একটি রীতি আছে। অবয়ব বা স্ট্রাকচার কোনো বিষয় বা বস্তুর সামগ্রিক গঠন বোঝায়। বিচ্ছিন্ন ঘটনা, বস্তু ধারণা নয় সবকিছুর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় অবয়ববাদের লক্ষ্য। অবয়ব উপাদানগুলির বিন্যাস-শৃঙ্খলা থাকে। এই শৃঙ্খলা অচল বা স্থানু নয়। গতি এবং রূপান্তর হল অবয়বের ধর্ম। অবয়বের আপন নিয়মেই এই পরিবর্তন ঘটে।

ভাষাবিজ্ঞানের মহল থেকে শুরু করে নৃতত্ত্ব অবধি নানা বিষয়ে স্পর্শ করে অবয়ববাদ সাহিত্যালোচনার প্রভাব ফেলেছে। ভাষার ব্যাকরণের মতে। গল্পেরও ব্যাকরণ আছে বলে ধরা হয়। কবিতার বিভিন্ন আলোচনা ধ্বনি, অর্থ, ব্যাকরণের জটিল বিন্যাসকে অবয়ববাদী দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। এসব দেখার মূলে আছে একটি নান্দনিক বোধ ।

এই রকম ধারণা থেকে লেভি স্তোস ও কিছুটা সরে এসেছিলেন। তাঁর রুশোপন্থী মোটিফ ধারণাকে আধুনিক সভ্যতার সমালোচনা, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির আদি অবয়ববাদের সঙ্গে মেলানো কঠিন। সাহিত্যিক অবয়ববাদের মূলে এইসব চেতনা ছাপ ফেলেছে। বিশেষ করে রাশিয়ান ফর্মলিজম এবং ভ্লামিদির প্রপের ছায়া সবচেয়ে প্রগাঢ়।

প্রাগ স্কুলের তাত্ত্বিকরা ও পেয়োজের এই দুটি সূত্র ধরে একটি আলোচক মহল গড়ে তোলেন। একে আমরা অবয়ববাদীদের প্রাগ গোষ্ঠী নাম দিতে পারি। কবিতার শৈলী নিয়ে অন্যান্য অবয়ববাদীরা ততটা ভাবেননি। প্রাগ-গোষ্ঠী কবিতার ভাষা নিয়ে নানা ভাবনা ভাবলেন। প্রাগ গোষ্ঠীর মতামত ছিল একান্তভাবে ভাষাবিজ্ঞান নির্ভর।

ভাষার দুটি শৈলী থাকে– সংশ্লেষক অন্যটি হল নান্দনিক। প্রথমটিতে মানুষের জ্ঞানসংবাদ জানানোর চেষ্টাই প্রধান । এই কাজ দুটি পদ্ধতিতে করা হয়। স্পটতদান বা যুক্তিদান। যুক্তি তত্ত্বের বিষয়কে স্পষ্টতা দেওয়ার জন্য ভাষার শব্দকে সুনির্দিষ্ট এবং একার্থকরূপে ব্যবহার করা হয়। তাই প্রমুখন হল ভাষার আদর্শ বলয় থেকে লেখকের সরে আসার প্রক্রিয়া। প্রতিদিনের কান্না - হাসির ছোঁয়া লাগা ধ্বনি, শব্দ বাক্য, খণ্ডবাক্য, প্রবাদ প্রভাবে কাব্যের সংসারে আলাদা ভাব পায়। বাংলার 'জানা' শব্দের প্রয়োগ এভাবে দেখা যেতে পারে– ১. আতাজাতীয় ফলবিশেষ ২. মাটির লবণ জাতীয় উপাদান।

এই সব আসার সীমানা সর কতটা? অনেক সময় ভাষার আদর্শরূপ থেকে সরে আসা নেই। অথচ একটা আলাদা সংগঠিত বাণীরূপ পাই। তাই কার ভাষা আদর্শ ভাষা বা মৌখিক ভাষার সমাহার ও বিন্যাসে ভাষানিয়ম ভেঙে ফেলবে, এমন আশা করা যায় না।

রোঁল বার্তের ধারণায় লিখনের শূন্যাঙ্ক ছিল, প্রাগ-গোষ্ঠীর ধারণা এরই পূর্বসরি। প্রাগগোষ্টীর এই প্রশ্নও ছিল যে এই ভাষাকে কী চোখে দেখব। কাব্যভাষাকে যদি বলি সংগঠিত বাণী, তাহলে অবয়ববাদের প্রশ্ন আড়ালে থাকে না। শৈলী বিজ্ঞানের কাজ হল, সংস্থানের নীতি গুলো আবিষ্কার করে শৈলী বৈশিষ্ট্য দেখানো। লেডি স্তোস অবয়ববাদের অন্য নাম বাক্যটা একটু অত্যুক্তি হলেও নৃতাত্ত্বিক অবয়ব সূত্র স্টরেৎসকর, য়াকোবসনের মধ্যে পেয়েছিলেন। ট্রবেসকয় স্তোসাকে আকর্ষণ করেছিলেন ঐ কারণে যে তিনি ভাষাবিজ্ঞানের পদ্ধতিগত অবয়ববাদ এবং সর্বজনীনবাদকে স্বীকার করে পরমাণুবাদকে খারিজ করেছিলেন। প্রাগের এই মহল ছিল ভাষাবিজ্ঞানের উপর একান্ত নির্ভরশীল।

এইসব অবয়ববাদীরা ভাষাবিজ্ঞানের কোনপথ বেছেছিলেন? প্রতিটি ভাষার যেহেতু অন্যান্য, সুনির্দিষ্ট এবং বিশেষ পদ্ধতিরূপ তাই তাদের একক উপাদানকে একটা সম্পর্কের সূত্র ধরে চিনতে হবে। ধ্বনি, শব্দ, অর্থ এইভাবে ভাষার একেকটি একক, আবার সকলের একটি জটিল সূত্রে জড়িত।

সাহিত্যের ভাষা তো সাধারণত ভাষিকব্যপোর নয়। তাই অসাধারণ ভাষার মধ্যে সম্পর্কের সূত্র কীভাবে খুঁজব? এদের সম্পর্কিত অস্তিত্বের ধারণা জোনাহান কালারের মতে দু শ্রেণির বিয়োজক এবং সংযোজক যেখানে উপাদানেরা একজাতীয় সেখানে সম্পর্ক হল আবয়িক এবং নির্বাচিত॥ সব মিলিয়ে এই ধারণায় খণ্ড এবং অখণ্ডের কল্পনা আছে। অন্যদিকে খণ্ডের সঙ্গে খণ্ডের এবং খণ্ডের সঙ্গে অখণ্ডের একটি সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে।

অবয়ববাদ এই নব ব্যাখ্যানে ব্যক্তিগত রুচির প্রভাব কমল। প্রচল সমালোচনার উচ্ছ্বাস ভরা অস্পষ্ট উচ্চারণের বদলে এর সাহিত্যভাষাকে বোঝার কঠিন পরিশ্রমী আরোহী সিদ্ধান্ত প্রবণতা। ভাষাশৈলীর এই অবয়বী দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস এখানেই শেষ হল ।

এরপর আমরা খুঁজতে চাই শৈলী বিজ্ঞানের নানা মহল কী কী? আমরা এই দীর্ঘ আলোচনা এই কারণে করলাম যে শৈলী নিয়ে নানা প্রদর্শন প্রস্থান সভায় ছিল। এই ভাবনা অখণ্ড নয়। আবার কালবিচারে বাস্তব জগতের তথ্যসংবাদ রূপে একটি শিল্পকর্ম কিংবা সাহিত্য বিশ্লষণাত্মক মূলক। যে জন্ম নাড়ির বাঁধন সমালোচনা তাকে ছিন্ন করে। তাই নব্য অবয়ববাদী সমালোচনা হল অনুপুঙ্খ পরীক্ষা ॥

প্রশ্নঃ কবিতার শৈলী, বিদায় কিভাবে বিচার করা যায় দৃষ্টান্তনার " বুঝিয়ে দিল।

Ans.: জীবনানন্দ দাসের যে কোন একটি কবিতার শৈলী ব্যাখ্যা করুন।

কবিতার শৈলী বিচারে আমরা গদ্যান্বয়ী অংশে দুর্বোধ্যতা মূল সুর, লেখকের চিত্রকল্প, প্রকরণের সঙ্গে প্রসঙ্গের মিল অমিল, উল্লেখের বৈচিত্র্য অলংকারের পরিমাণ, বাক্যের গড়ন এবং সর্বোপরি অবয়বজ্ঞান লক্ষ করব। কবিতার শরীরে লেখকের মন কতটা ধরা পড়েছে এটা জানা দরকার॥ এই কাজ করতে গেলে খুব পরিচিতি একটা কবিতা বাছলে ভালো হত। আমরা একটি অল্প চেনা তথা জীবনানন্দ দাশের 'পরস্পর' কবিতায় শৈলী বিচার করব॥

কবিতাটির গড়ন, বক্তব্য এবং যুগের ছবিতে অমাদের ভাবিয়েছে। এই ভাবনা কেন জাগল, তার উত্তর খুঁজতেই আমাদের আলোচনা চলবে। এখানে বলা ভালো কবিতাটি দীর্ঘ। কারোর কারোর মতে দীর্ঘ কবিতা আসলে খণ্ড কবিতারই মালা। একটি কবিতার শৈলী বিচার সম্ভব হলেও দীর্ঘ কবিতায় তা সম্ভব নয় বলে তাঁরা মনে করেন।

জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এই কবিতাটি কাব্যরসিক মহলে প্রায় অনালোচিত। অথচ কবিতাটিতে বক্তব্য ছাড়াও শৈলীর বিচিত্র প্রকাশ দেখতে পাই। এমনকি জীবনানন্দের বিশেষ প্রবণতা বোঝাতে এই কবিতাটির মূল্য আছে। কবিতার কথা জানতে গেলে জীবনানন্দের সুখ্যাত কবিতাগুলির পাশে এটির মূল্য আছে। জীবনানন্দের কব্যিক জীবনের প্রাথমিক ভাঙচুরের কথাও এই কবিতা থেকে জানতে পারি। অন্যদিকে এটি সংক্ষিপ্ত নয়, দীর্ঘ কবিতা। এর মধ্যে কাহিনী বয়নের ঢং আছে। প্রাচীনকালে নারী থেকে একালীন পণ্যার মধ্যে নারীচেতনার একটা পরিবর্তন স্রোত লক্ষ করা যায়। সংলাপ আছে, আসলে এটি ছোটগল্প না হয়ে কীভাবে কবিতা হল ?

৩টি গল্প রয়েছে। একটি নিঃসাড় পুরী, পাহাড়, পালংকে সোয়া রাজকন্যার শরীর রূপকথার সব আয়োজনই তিনি করেছেন। কিন্তু রূপকথার গল্পে লেখকের নিজরে কথা থাকত না। একজন রূপসীর সন্ধানে পৃথিবীর পথে ঘুরে ঘুরে সেই রাজকন্যার সন্ধান তিনি পেয়েছেন। রাজকন্যা ঘুমের অতলে। কবি তার পাষাণের মতো হাতে প্রাণ জাগাতে পারেন নি। এমনও সংশয় জেগেছে যে, হৃদয় থাকলেও তা কবির জন্য প্রস্তুত

ছিল না। তাই বিনীত জাগে যদি রাজকুমার তার হাত ধরে হৃদস্পন্দন জাগান। এখানে প্রথম গল্প বা অংশের সমাপ্তি। এ যুগের লেখক রূপকথার জগতে প্রাণের স্পন্দন শুনতে পেলেন।

'আসিবে না গতি যেন কোনদিন তাহার দু'পায়ে
পাথরের মত সাদা পায়ে
এর যেন কোনদিন ছিল না হৃদয়।'

মসৃণ হাড়ের মতো সাদা হাত, পাথরের মতো গা আর যাই হোক জীবনের নয়। এই শুভ্রতা আমাদের কাছে প্রশংসনীয় নয়। যেমন বাংলার কাছে ক্যাটক্যাটে সাদা, আবার হাড় এবং পাথরের তুলনা একটা কাঠিন্য এবং নিষ্প্রাণতা সঞ্চার করেছে রাজকুমারীর ছবিতে।

রাজকুমার দ্বিতীয় গল্পের কথক। তার চোখে নারীর অন্য রূপ ফুটে ওঠে। সেও ঘুমন্ত। এখানে পাহাড় নেই, নিস্তব্ধতা নেই, নদী আছে। সে নারী মৃচ্ছকটিকা বসন্তসেনার মতো নয়, কিংবা হবে তাই। বসন্তের আহ্বানে তাকে দেখেছিলেন নদীর কিনারে জমানো ফেনার মত। এ নারীও অচেতন। হাতির দাঁতের মতন শাদা হাতে শাদা স্তন ঢেকে সে শুয়ে আছে। এই দেখাও নিবু নিবু জ্যোৎস্নায় এই ছবি, স্বপ্নের এই প্রাণহীন প্রতিমা দিন বা বাস্তবতার প্রখর আলোয় মুছে যায়।

আবার ওঠে পরিকল্পনার কথা। কয়েকটি চরিত্র এনে গল্পের আভাস জাগলেও কথাবার্তার আবহাওয়া রচিত হলেও কবির চোখে নারীর রূপ আড়াল থাকে নি। এই কবিতাটি দীর্ঘ। কেননা যুগে যুগে অঙ্কিত নারীরূপের অসারতা দেখানো হয়েছে। 'সোনার আঁচল খসা, হাতে দীপশিখা ধরে যে নারীকে রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন সেই কল্যাণময়ীর ব্যবহারিক রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

উপন্যাসের বর্গীকরণের প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা করে প্রসঙ্গ ও সমস্যাতত্ত্ব কীভাবে উপন্যাসের গৃহীত হয় লিখুন। উপন্যাসশৈলী নিয়ে কয়েকটি মানক (প্যারামিটার) আগে স্থির করা প্রয়োজন। এই মানকগুলি সর্বত্রই স্থির থাকবে এমন বলতে চাওয়া হচ্ছেনা। বরং উপন্যাসের শৈলীচার এরা একটা পথ নির্দেশ করতে পারে। এই মানকগুলির প্রয়োগ এবং তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা একসময় বাংলা উপন্যাসের আটটি নমুনা নিয়ে দেখানো হয়েছিল। এখনও অবধি সেই আলোচনার কাঠামো পরিবর্তনের কোনো জোরালো কারণ ঘটেনি বলে আমরা সেগুলি পুররুক্ত করছি।

যে উপন্যাস বা উপন্যাসাবলির বিচার সমালোচক করবেন তার বর্গ সবচেয়ে আগে নির্ণয় করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তিনি প্রবল সমালোচনার পথিক হবেন না, এমন নয়। তবে সংস্কার মুক্তির ও প্রয়োজন আছে। প্রাক্তন সমালোচনায় চরিত্র তেমন গুরুত্ব পায়নি বলে কিংবা চরিত্র প্লটের সম্পর্ক জটিল বলে মাঝে মাঝে উপন্যাসের বর্গবিচারে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। সমাজ বা পরিবার থাকলেই তা সামাজিক বা পারিবারিক উপন্যাস হয়ে ওঠে না। লেখক পাঠককে সমাজের কেন্দ্রে না বিশেষ চরিত্রের অন্দর মহলে হাজির করবেন, তার সেই চেষ্টার ওপর উপন্যাসের সামাজিকত্ব বা চরিত্র প্রাধান্য নির্ভর করে। পদ্মা নদীর মাঝিতে প্রথম দিকে যেমন জেলে সমাজের বিস্তৃত বিবরণ আছে, তেমনি পরের দিকে কুবের কথাই আমাদের মনে পড়ে। কুবের যদি জেলে সমাজের প্রতীক হয়, তাহলে এটি সামাজিক উপন্যাস হয়ে উঠবে। শালোখঙ্কের ডন সিরিজ একটি সমাজের অঞ্চলে জীবন কথা হয়ে উঠছে। পদ্মানদীর মাঝিতে সেই সম্ভাবনা কোথায়? সমালোচক তাই প্রসঙ্গ ও চরিত্রের সৃষ্ট বিচার শ্রেণি ও ব্যক্তি পারস্পরিক ঔপন্যাসিক গুরুত্ব স্থির করবেন ।

কোনো সময় উপন্যাসের যা কিছু ঘটমান, তা লেখকের মানসিক আয়নার প্রতিফলন। তিনি বিশেষ তত্ত্বের উপযোগী আদর্শ ঘটনাকে বেছে নেন। তাই বাইরে তারা ঘটনার প্রতিভাস জাগলে ও অন্তরঙ্গে একটি তত্ত্বকে নানাভাবে দেখার ক্রিয়াই তারা সাধন করে। ঔপন্যাসিক এই বিশেষ তত্ত্বমুখিতা না বুঝলে রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ মানিকের চতুষ্কোণ সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী পড়ে মনে হতে পারে এগুলি অসংলগ্ন রচনা।

সামাজিক মানুষের জীবন কেন্দ্রীয় সমস্যা হল রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, প্রেম এবং ধর্মজড়িত। এদের মূখ্য ভাবলে গৌণ সমস্যার উৎপত্তি হয়। ব্যক্তি মানুষের মানস দর্পণে এরা কয়েকটি ছায়া ফেলে। যেমন বলতে পারি ঐতিহ্য হিসেবে ব্যাখ্যা ঔপন্যাসিক জানের তিনি কেন্দ্রীয় সমস্যার একটি কাহিনীমূলক শিল্পরূপ সৃষ্টি করতে চান। সেই সৃষ্টি কর্মে চান। সেই সৃষ্টি কর্মে লেখকমনের ব্যক্তিগত প্রবণতা অনুযায়ী গৌণ সমস্যা তাই মুখ্য হয়ে ওঠে। আমার প্রস্তাবিত গৌণ সমস্যাগুলি কেন্দ্রীয় সমস্যাভূমি থেকে জাত বলে পাঠক কেন্দ্রীয় সমস্যারও স্বাদ পান। সহজ কথায় কেন্দ্রীয় সমস্যার ধারণাটি হল সামাজিক বিজ্ঞান নির্ভর আর গৌণ সমস্যাগুলি উপন্যাসের ধারণা জাত।

উপন্যাস প্রসঙ্গ ব্যাপারটি অনেক সমালোচকদের কাচে কাহিনীর সারোৎসব বলে অনুমিত হয়েছে। লেখকের অনুসারী হয়ে তাই তারা দুবার কথনে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। প্রসঙ্গ এদের কাছে অনন্ত। আমরা প্রসঙ্গ বলতে অন্য কথা বলতে চাই। প্রসঙ্গ মানে কাহিনী নয়। তা হল জীবনের প্রবাহ থেকে নির্বাচিত কয়েকটি নির্দিষ্ট সমস্যা। এই সমস্যার কূটতা ঔপন্যাসিককে স্পন্দিত করে। তিনি কাহিনীর ছকে ঐ সমস্যা তোলেন। সমাধান সেখানে থাকতে পারে নাও থাকতে পারে। সামাজিক মানুষরূপে অনুভবের শিল্পীরূপে জীবন সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করা, তাদের বৈচিত্র্যকে ধরার আনন্দ তিনি পাঠককে সংক্রামিত করতে চান। তিনি জীবন ও জগতের একটি ব্যাখ্যা নিকর্ম উপহার দিতে চান। ব্যাখ্যান নানাভাবে হতে পারে।

যদি কাহিনি ঐতিহাসিক চরিত্র বা প্রেক্ষাপটে গঠিত হয়ে ঔপন্যাসের জীবনব্যাখ্যান উপস্থিত করে, তাহলে তা ঐতিহাসিক উপন্যাস। মানবীয় প্রেমসম্পর্ক এবং প্রেমহীনতা কোনো উপন্যাসে জটিল সমস্যারূপে চিহ্নিতরূপ হতে পারে । আবার অন্য জায়গায় তো জটিল সহকারী